এই সময়

ধসা রোগে দায়ী বিদেশি ছত্রাক

স্নেহাশিস নিয়োগী

রাজ্যে প্রায় প্রতি বছরই ধসা রোগে নষ্ট হয় প্রচুর আলু। ২০১৩-১৪ সালে তা মহামারীর আকার নিয়েছিল। এত দিন জানা ছিল, আলুর ধসা রোগের নেপথ্যে থাকে ফাইটোপথোরা ইনফেসট্যান্স নামের এক ছত্রাক। নতুন যে তথ্য জানা গিয়েছে, তা হল ওই সময়ে রাজ্যে আলুর ধসা রোগের নেপথ্যে কোনও দেশি নয় একেবারে ইউরোপ থেকে আসা ফাইটোপথোরা ইনফেসট্যান্স-এর এক পরদেশি রূপ (১৩_এ২ জিনোটাইপ) ব্লু ১৩'-এর হাত রয়েছে। এমনই দাবি পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের প্রধান ডঃ সঞ্জয় গুহ রায়-এর। তাঁদের গবেষণাপত্র মঙ্গলবারই বিশ্বখ্যাত জার্নাল নেচার প্রকাশনার সায়েন্টিফিক রিপোর্টসে প্রকাশিত হয়েছে।

ফাইটোপথোরা ইনফেসট্যান্স 'ব্লু ১৩'-এর অনেক রূপে (ভ্যারিয়েশন) অস্তিত্ব রয়েছে, পরিভাষায় যাকে বলে ২৪ মাল্টি-লোকাস জিনোটাইপস। যার মধ্যে ১৯টিকে এর আগে দেখা যায়নি। এই গবেষণাতেই তার অস্তিত্ব প্রথম মিলল। এই 'ব্লু ১৩'-র মধ্যে একই ধরনের পূর্বসূরির থেকে তৈরি হওয়ার (ক্লোনাল লিনিয়েজ) প্রমাণও মিলেছে। পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের প্রধান ডঃ সঞ্জয় গুহ রায়ের নেতৃত্বে ও সিএসআইআর নয়াদিল্লির অর্থ সহায়তায় হওয়া এই গবেষণাপত্রটির রিসার্চ স্কলার তন্ময় দে'র নামে প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়াও গবেষকদলে ছিলেন, আমেরিকার কর্নেল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক উইলিয়াম ফ্রাই, নর্থ ক্যারোলিনা স্টেট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক জিন রিস্তাইনো ব্রিটেনের জেমস হুটন ইনস্টিটিউটের ডেভিড কুক, আইআইসিবি কলকাতার সুচেতা ত্রিপাঠিরাও। গবেষণায় বলা হয়েছে, ইউরোপ থেকে বীজের মাধ্যমেই ২০০৮ সালে দক্ষিণ ভারতের টম্যাটোর ফলনে ধসা রোগ ছড়ায়। তারপর ২০১৪ সালে তা পশ্চিমবঙ্গ, বিহার এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নানা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেইসঙ্গে এই ধরনের জীবাণু বাংলাদেশ থেকে হাওয়ার মাধ্যমেও পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে পূর্ব ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল বলে গবেষণাপত্রে দাবি।

'নেচার'-এ দাবি বাঙালি গবেষকের

ধসা রোগে প্রতি বছর নষ্ট হয় আলুর ফলন — এই সময়

সঞ্জয়ের কথায়, 'বছর তিনেক আগে আলুর নাবি ধসা রোগে কৃষকরা সর্বস্বান্ত হওয়ার পরই হুগলি ও বাঁকুড়ার বিস্তীর্ণ এলাকায় এ ব্যাপারে বিশদ তথ্য সংগ্রহে নামা হয়েছিল। জিপিএস পদ্ধতিরও সাহায্য নেওয়া হয়। গবেষণাপত্রে নির্দিষ্ট কিছু উপায়ে এই জীবাণুকে সঠিক ভাবে চিহ্নিত ও নির্বাহ করার কথাও বলা আছে।' যার ভিত্তিতে এই সব প্রজাতিকে আলাদা করা যায়। এমন একটি উপায় হল-সিম্পল সিকোয়েন্স রিপিট অ্যানালাইসিস। এদের জিনে কিছু নির্দিষ্ট রিপিট রিজিওন থাকে। যার উপর নির্ভর করে প্রজাতিগুলিকে বিশ্লেষণ করা যায়। এই গবেষণাপত্রে সেই উপায়ের কথাও বলা হয়েছে। যেমন-ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্টিং, কিছু বিশেষ জিনের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ। এছাড়াও কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, যেমন-তাদের সংক্রমণ করার ও আগ্রাসনের ক্ষমতা, মেটালাক্সিক ছত্রাক নাশকের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া এবং এরা ঠিক কোন লিঙ্গের জীবাণু সেটাও গবেষণাপত্রে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

আলু চাষে পশ্চিমবঙ্গ সারা দেশে দ্বিতীয় স্থানে থাকলেও প্রতি বছরই নাবি ধসা রোগের কম-বেশি প্রাদুর্ভাব সব আলু খেতেই দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্বাঞ্চলে আলুর ধসা রোগের জীবাণু 'ব্লু ১৩' হলেও তাদের চারিত্রিক ও জিনগত বৈশিষ্ট্যতে পার্থক্য রয়েছে, যা মূলত অভিব্যক্তির জন্য হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই নতুন ধরণের ফাইটোপথোরা ইনফেসট্যান্স আগের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী, এদের সংক্রমণের ক্ষমতাও বেশি। এমনকী তারা চরিত্রগত ভাবে নানা ছত্রাকনাশক-এর প্রতিরোধীও। পশ্চিমবঙ্গে যে সব জাতের আলু চাষ হয়, তার প্রায় সবক'টি ক্ষেত্রেই ব্লু ১৩ সংক্রমণে সক্ষম।

এছাড়া আরও যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে এসেছে, তা হল ভৌগোলিক অবস্থানের উপর ভিত্তি করে ব্লু ১৩-এর উপস্থিতি ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য রয়েছে। যার জন্য কোনও একটি নির্দিষ্ট প্রতিরোধী উপায় সব জায়গায় সমান ভাবে ব্যবহার করে এদের নির্বাহ করা যাবে না। এই রোগকে ঠিক কোন কোন ছত্রাক নাশক সঠিক মাত্রায় ঠিক কোন জায়গায় প্রয়োগ করে যথাযথ ভাবে নির্মূল করা যাবে। তার কিছু উপায়ও গবেষক দল খুঁজে পেয়েছেন। যা শীঘ্রই অন্য একটি গবেষণাপত্রে প্রকাশ হবে।